# মধুসূদনের কাব্যে নারী : নবচেতনার আলোকে

ড. অর্পিতা দাস [২৪]

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শ ও ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার এদেশীয় মানুষের চিন্তা-চেতনার জগতকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। নবচেতনার আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত বাঙালি মুক্তি পেতে চেয়েছিল যুগ যুগ ধরে চলে আসা বিবিধ কুসংস্কার ও নানা অন্ধ বিধিনিষেধের গন্ডি থেকে। এর ফলে এই সময়ে দেখা দিয়েছিল বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অথচ সবচেয়ে অবহেলিত নারী সমাজের জন্য ভাবতে শুরু করেছিলেন অনেকে। চরম অমানবিক সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবার পুনর্বিবাহের প্রচেষ্টা, কৌলীন্য প্রথা বন্ধের উদ্যোগ, নারী শিক্ষা প্রচলনের উদ্যোগ প্রভৃতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উনিশ শতকীয় নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যক্তিমানুষের প্রতি গুরুত্ব প্রদান। ফলে যে নারী এতদিন পর্যন্ত পারিবারিক বা সামাজিক আচার-আচরণ ও অন্ধ বিধিনিষেধের গন্ডিতে আবদ্ধ ছিল, যাদের মর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল উপেক্ষিত, উনবিংশ শতাব্দীতে এসে ধ্বনিত হল তাদের মুক্তির আহ্বান। বলা ভালো, নবজাগরণের প্রভাবে এদেশের নারীরা আপন মর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসহ নবরূপে আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু নারীর এই নবরূপে প্রতিষ্ঠা খুব সহজে হয়নি। নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার নারীর চিন্তা চেতনার জগতে পরিবর্তন এনেছিল। নারীরা চেয়েছিল শিক্ষিত পুরুষের যোগ্য জীবনসঙ্গিনী হয়ে উঠতে। অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব পুরুষের দৃষ্টিতেও নারী সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

সাহিত্যে নারীর ব্যক্তিত্বময়ী রূপকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য অনেক সময় সাহিত্যিকেরা বেছে নিয়েছেন পুরাণের নারী চরিত্রগুলিকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবিদার মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না; কিন্তু মনের সমর্থন ছিল। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের কারণে মধুসূদনের সাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, অসম্মানিত নারী সম্পর্কে মুক্ত চিন্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়; দেখা যায় তাদের সবরকম বন্ধন মুক্তির শিল্পিত প্রয়াস। এরই পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে সনাতন ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বোধ। নবযুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বোধ আর জীবনাভিজ্ঞতা; বিশ্বদর্শনে অর্জিত জ্ঞান; ও বিশ্বসাহিত্যে অগাধ বিচরণ মধুসূদনের মনকে ব্যাপ্তি দিয়েছে। তাঁর কাব্যের অধিকাংশ চরিত্রই ভারতীয়। কিন্তু সেই ভারতীয় নারী দেহে ইউরোপীয় চেতনার সম্মিলনে যে নবতর চেতনার উন্মীলন তা-ই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। আমরা মূলত তাঁর কাব্যগুলিতে বিশেষ করে 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২)-এ নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রূপকে দেখানোর চেষ্টা করব।

---



'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রমীলা চরিত্র সৃষ্টিতে দেশ-বিদেশের নানা বীরাঙ্গনা-নারীমূর্তির সংস্কার যে মধুসূদনের মনে ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। রঙ্গলালের পদ্মিনী, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, ট্যাসো-র 'জেরুজালেম ডেলিভার্ড' কাব্যের ক্লরিন্ডা, হোমার-এর 'ইলিয়াড' কাব্যের এথিনী ও ভার্জিল-এর ক্যামিলা চরিত্রের মিশ্রনে প্রমীলা অঙ্কিত। কিন্তু একটু গভীর দৃষ্টি দিলেই যেখা যাবে যে প্রমীলা এদের কারোরই অবিকল প্রতিরূপ নয়। পূর্ণাঙ্গ নারী চরিত্র সম্পর্কে মধুসূদনের ধারণাটি এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি, বীরত্ব-শৌর্যের প্রতীক; অন্যদিকে আবার ভারতীয় কুলবধূর কোমলতা ও মাধুর্য তার মধ্যে লক্ষণীয়। লঙ্কায় স্বামীর সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে গমনোদ্যত রণসাজে সজ্জিতা প্রমীলা যখন সখী বাসন্তীর সকল আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়ে বলেন --

*পর্বত গৃহছাড়ি*
*বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে*
*কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?*
*... ... পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে*
*দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি।*

তখন আমরা চমৎকৃত হই, কিন্তু বিস্মিত হই না। কারণ প্রমীলা পতিগতপ্রাণা প্রেমিকা নারী। নবম সর্গে স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জনে উদ্যত প্রমীলার মধ্যে ভারতীয় নারীর চিরায়ত রূপ স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় একই প্রেমের নামে প্রমীলা কখনও বীরাঙ্গনা, কখনও কুলবধূ।

প্রখর মিলনের এই তত্ত্ব কবি-কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে বলেই প্রমীলা চরিত্রে বাহ্যত অসঙ্গতি থাকলেও ভিতরের সৃষ্টি-তত্ত্বের মধ্যে সঙ্গতি রয়েছে। আসলে মধুসূদন নানা বৈশিষ্ট্যে প্রমীলা চরিত্রটিকে সৃষ্টি করে নবযুগের স্বাধীন চিত্ততা ও স্বাধিকার ঘোষণায় বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর দান করে তাঁর চরিত্রটিকে ব্যক্তিত্ব মন্ডিত করেছেন।

রাক্ষসরাজ রাবণের বহুপত্নীর একজন হলেন চিত্রাঙ্গদা। যিনি একই সঙ্গে পুত্র-বৎসলা ও সত্যবাদিনী। তাঁর ধারণা পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু হয়েছে দেশোদ্ধারের জন্য নয়, রাবণের কৃতকর্ম পাপের জন্য ---

*দেশবৈরী নাশে যে সমরে,*
*শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি*
*হেন বীর প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।*
*কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;*
*কোথা সে অযোধ্যাপুরী? ....*

*.....*
*কে, কহ, এ কাল অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি*
*লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ নিজ কর্ম্ম-ফলে*
*মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি!*

প্রকাশ্য রাজসভায় উপস্থিত হয়ে, সাহসিকতার সঙ্গে অকাট্য যুক্তি দিয়ে যেভাবে স্বামীর কাজের সমালোচনা করেছেন তা তাঁকে একই সঙ্গে বিদ্রোহিনী এবং ব্যক্তিত্বময়ী নারী রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। নারীর এই রূপটি মধুসূদনের সমকালে বা তাঁর পূর্বে বাঙালি সমাজে ছিল অকল্পনীয়।

Scanned by CamScanner